ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-IV, March, 2026, Page No. 1489-1501
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.04W.370

স্বাধীনতা-পরবর্তী বাংলা দলিত সাহিত্য: একটি সামাজিক-সাংস্কৃতিক পাঠ

রাজা তালুকদার, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 20.03.2026; Accepted: 21.03.2026; Available online: 31.03.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Post-independence Dalit literature in India emerged as a powerful voice of protest, identity, and social transformation. Rooted in the historical experiences of caste-based oppression, it reflects the lived realities of marginalized communities who were long excluded from mainstream literary and cultural spaces. After 1947, with the spread of education, democratic ideals, and constitutional rights, Dalits gradually gained the confidence to articulate their own stories, pain, and resistance. Dalit literature is not merely a literary expression but also a socio-political movement. It challenges the deep-rooted caste hierarchy, untouchability, and systemic discrimination prevalent in Indian society. Inspired largely by Dr. B.R. Ambedkar's ideology of equality, education, and self-respect, Dalit writers began to assert their identity and dignity through their works. They rejected upper-caste literary norms and instead focused on realism, directness, and authenticity. The movement first gained prominence in Marathi literature during the 1960s and later spread to other Indian languages, including Hindi, Tamil, Telugu, and Bengali. Dalit autobiographies, poems, short stories, and novels became significant forms through which writers expressed their struggles against poverty, humiliation, and social exclusion. In post-independent India, Dalit literature also became closely associated with political awakening and activism. It highlighted issues such as land rights, labour exploitation, gender discrimination, and violence against Dalits. Over time, it established itself as an important and independent literary tradition, giving voice to the voiceless and reshaping Indian literature by bringing marginalized perspectives to the forefront.

Keywords: Dalit, Bengal, Independence, Movement, Literature

বাংলা সাহিত্যে আধুনিক যুগ শুরু হওয়ার আগে প্রাচীন ও মধ্যযুগ বলে যে দুটি সাহিত্য পর্ব ছিল সেখানে অন্ত্যজ, ও অস্পৃশ্যরা থাকলেও তারা কখনোই কেন্দ্রীয় বিষয় হয়ে ওঠেনি। তারা যেন প্রান্তিক থেকে গিয়েছিল। চর্যাপদের কিছু পদে কিংবা মঙ্গলকাব্যের আখ্যানভাগে শ্রমজীবী মানুষের কথা এলেও তা ছিল সীমিত ও পরোক্ষ। বিশ শতকে এসে সাহিত্যে প্রান্তিক মানুষের জীবন আরও স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হতে থাকে। যদিও সেসময় জাতিগত প্রশ্ন সবসময় মুখ্য হয়ে ওঠেনি; বরং লেখকদের দৃষ্টি বেশি ছিল শ্রমজীবী ও নিপীড়িত মানুষের সামগ্রিক দুঃখকষ্টের প্রতি। সমাজের জাতিভিত্তিক বিভাজনে যারা উপেক্ষিত, তাদের কথা ধীরে ধীরে সাহিত্যে স্থান পেতে শুরু করে বিশ শতকের প্রথমার্ধে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে দলিত সাহিত্যের যে উপস্থিতি

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে দেখা দিয়েছে তা বাংলায় বিশেষ দেখা যায়নি। উপস্থিতি বলতে বোঝাতে চাইছি ছাপার মাধ্যমে প্রকাশিত, সংকলিত,আর তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে চর্চিত হয়ে সাহিত্যের এক বিশিষ্ট ধারারূপে গৃহীত হওয়া। ভারতবর্ষে 'দলিত সাহিত্য'এবং দলিত বোঝানোর জন্য প্রথমেই বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ করতে হয়। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ভারতবর্ষের বর্ণাশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যেভাবে সমাজ গঠিত হত, তাতে সমাজের উচ্চ তিন বর্ণের প্রতি সব সুবিধা প্রদানকারী চতুর্থ বর্ণটি সেই খেটে খাওয়া মানুষগুলো যুগে যুগে নির্যাতিত ও শোষিত হয়ে এসেছিল। তারা ছিল সমাজের 'দলিতবর্গ'-উপেক্ষিত, অনিকেত, অস্পৃশ্য, পীড়িত ও অসহায় জনতার দল। বর্ণশ্রমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় শ্রেণিবিভাজন একটি অভিশাপ। সেই অভিশাপের হাত থেকে আমরা এখনো মুক্ত হতে পারিনি। এই অভিশাপের ফলে দলিতদের দলিত্ব দিন দিন আরো বৃদ্ধি পাচ্ছে। দলিতদের দুঃখ,হয়রানি,দাসত্ব,অধঃপতন,দরিদ্রতা ইত্যাদির শৈল্পিক প্রকাশ যে সাহিত্যের মধ্যে দেখা যায় তাকেই বলা হয় দলিত সাহিত্য। দলিত সাহিত্য নিছক সাহিত্যকর্ম নয়, দলিত সাহিত্য একটি আন্দোলনের নাম। এই আন্দোলন জাতপাতের কুসংস্কার, আর্থ-সামাজিক বৈষম্য ও ধর্মীয় শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। 'দলিত সাহিত্য' শব্দটি চলু হয়েছিল ১৯৫৮ সালে আয়োজিত "দলিত লিটারেচর কনফারেন্স"[১]এ। ভারতবর্ষে প্রথম মারাঠি ভাষায় দলিত সাহিত্য রচনা আত্মপ্রকাশ করলেও আজ তা বিভিন্ন ভাষায় বেগবতী স্রোতস্বিনী। বর্তমানে দলিত সাহিত্যের প্রধান উৎস হিসেবে আম্বেদকরের দর্শন ও তাঁর আন্দোলনকে ধরা হয়।

১৯৪৭-এর পর দলিত রাজনীতির ধরণ ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়। নব্বইয়ের দশকের আগে দলিত আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল শিক্ষা ও চাকরিতে সংরক্ষণ। পরবর্তীকালে কৃষিজমির অধিকার, ন্যূনতম মজুরি এবং দলিতদের উপর অত্যাচারের মতো বিষয়গুলো গুরুত্ব পায়। আন্দোলন ক্রমে রাজনৈতিক রূপ নেয় এবং দলিতরা সংগঠিতভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করতে শুরু করে— নির্বাচনে লড়াই করা, দাবি আদায় করা ও দলিত প্রার্থীদের সমর্থন করা প্রধান লক্ষ্য হয়ে ওঠে। অন্যদিকে, ১৯৮৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বহুজন সমাজ পার্টি (BSP) অনেক বেশি সাফল্য অর্জন করে। ১৯৮৯ থেকে ২০০২ সালের মধ্যে উত্তরপ্রদেশে এর রাজনৈতিক প্রভাব দ্রুত বৃদ্ধি পায়। কাঁশিরামের নেতৃত্বে এই দল 'বহুজন' ধারণাকে সামনে এনে ভারতীয় রাজনীতিতে নতুন দিশা দেয় এবং দলিতদের রাজনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের পথ তৈরি করে। ২০০৬ সালে কাঁশিরামের মৃত্যুর পর মায়াবতীর নেতৃত্বে দল এগিয়ে চলে। ১৯৯৫ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে কয়েকবার উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হন, প্রথম দলিত মহিলা মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি জাতীয় রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলার মানুষের কাছে প্রান্তিক কথাটি বহুদিন আগে পরিচয় হলেও বাংলার মানুষের কাছে দলিত শব্দটি নতুন। বাংলার দলিত সাহিত্যের যাত্রা শুরু হয়েছে মহারাষ্ট্রে শুরু হওয়ার প্রায় বছর কুড়ি পরে। আটের দশকের মাঝামাঝি 'বঙ্গীয় দলিত লেখক পরিষদ' গঠনের মধ্য দিয়ে দলিত সাহিত্য আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে প্রথম বিকশিত হতে শুরু করে। নকুল মল্লিক হন এর সম্পাদক আর বিমল বিশ্বাস সভাপতি। অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন রণেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৮৭ সালের এপ্রিলের শেষ দিকে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুরে প্রথম দুইদিন ব্যাপী দলিত সাহিত্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে ১৯৯২ সালে কলকাতার সল্টলেকে মূলত স্বপন বিশ্বাসের উদ্যোগে গড়ে ওঠে 'বাঙলা দলিত সাহিত্য সংস্থা'। অমর বিশ্বাস হন সম্পাদক, সভাপতি হন অধ্যাপক জগদ্বন্ধু বিশ্বাস আর কোষাধ্যক্ষ হন ঊষারঞ্জন মজুমদার। এই সংস্থার উদ্যোগে ১ম বর্ষ দলিত সাহিত্য সম্মেলন (সঙ্গীতি) হয় নদীয়া জেলার বগুলার সন্নিকটে ভায়না গ্রামে, ১৯৯২ সালের ৫-৬ ডিসেম্বর। দলিত মানুষদের মাঝখানে গিয়ে কাজ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এই সংস্থা পরবর্তীকালে উত্তর ২৪ পরগণার হৃদয়পুর, হুগলীর খন্যান, মালদহের পাকুয়াহাট, দক্ষিণ ২৪ পরগণার রঘুনাথপুরে (মাধবপুর) ও চক পাঁচঘরিয়ায়, পুরুলিয়ার আদ্রায়, হুগলির কামারকুণ্ডু, পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি প্রভৃতি স্থানে রাজ্য সম্মেলন এবং রাণাঘাটের কুপার্স ক্যাম্প

ও মুর্শিদাবাদের জঙ্গীপুরে জেলা সম্মেলন করে এবং প্রবল উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে সকলকে সংগঠিত করে দলিত সংস্কৃতি চেতনাকে ছড়িয়ে দিতে থাকে।

দলিত আন্দোলনের প্রাণপুরুষ বাবা সাহেব আম্বেদকরের সাথে বাংলার সম্পর্ক ছিলো গভীর এবং নিবিড়। এই বাংলারই এক প্রান্ত থেকে তিনি যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডলের মহতী প্রয়াসে সংবিধান সভার প্রতিনিধিত্ব করার জন্য নির্বাচিত হন। বাংলার দলিত মানবগোষ্ঠীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা সচেতন, সংগঠিত অগ্রবর্তী অংশ নমঃশূদ্র। যাদের ১৯৯১ সালের পূর্ব পর্যন্ত চণ্ডাল বলা হতো। বর্তমানে যার সংখ্যা প্রায় ২ কোটির কাছাকাছি। নমঃশূদ্র মানুষদের ৯০ শতাংশের বসবাস ছিলো পূর্ব বঙ্গের ফরিদপুর, খুলনা, যশোর জেলাগুলোয়, যে জেলাগুলো দেশভাগের ফলে পূর্ব পাকিস্তানের(বর্তমানে বাংলাদেশ) অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ভয়ে ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ হয়ে রাতের অন্ধকারে সর্বস্ব হারিয়ে এই সব মানুষেরা পালিয়ে আসেন এপার বাংলায়। এপার বাংলায় এসে তাদের সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। বতর্মান বাংলার দলিত সাহিত্য সেই অন্ধকার সময় কাটিয়ে মাথা উঁচু করে চলতে শুরু করেছে, একঝাঁক কবি, ঔপন্যাসিক, গল্পকার, প্রবন্ধকার, নাট্যকার এগিয়ে এসেছেন। যাঁদের রচনা স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উজ্জ্বল। যে দলিত, সে শুধুমাত্র জন্মজনিত কারণে অর্থনৈতিক বঞ্চনার সাথে উপরি পায় অস্পৃশ্যতাসহ চরম ঘৃণা অপমান। এ যন্ত্রণা একা তার, যা জীবনধারণের যন্ত্রণাকে শত সহস্রগুণ অসহনীয় করে তোলে। এ যন্ত্রণার সামান্যতম অনুধাবন অদলিত জাতের কোনও মানুষের পক্ষেই বোঝা সম্ভব নয়। তাদের যন্ত্রনার কথা এভাবে বলা যায়–

"সে যাতনা বিষে
বুঝিবে সে কিসে
কভু আশি বিষে
দংশেনি যারে।"[২]

বাংলার দলিত সাহিত্য আন্দোলনের মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে মতুয়া সাহিত্য বিষয় দু'এক কথা বলে নেওয়া খুব দরকার, যে সাহিত্য জাতিভেদ ব্যবস্থা, ঘৃণা এবং গোলামির দর্শনতত্ত্বকে নস্যাৎ করে চৈতন্যদেব প্রতিষ্ঠিত 'বৈষ্ণব' ধর্মের মতো এক বিশ্বজনীন ধর্ম আবেদনে সমৃদ্ধ। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সমাজ-সংস্কৃতি ধর্ম রাজনীতির ক্ষেত্রে মতুয়াধর্ম আন্দোলন একটি যুগান্তকারী ঘটনা। মতুয়া ধর্ম আন্দোলন মূলত পূর্ব বঙ্গের সবচেয়ে সংগঠিত, অধিক সংখ্যক, অপেক্ষাকৃত সচেতন, শিক্ষিত হয়ে ওঠা নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষকে আবর্তন করে গড়ে ওঠা একটি আন্দোলন। এই ধর্ম আন্দোলনের জনক হরিচাঁদ বিশ্বাস। যাঁকে মানুষ হরিচাঁদ ঠাকুর বলেন। তাঁর জীবদ্দশায় দীর্ঘ ৬৬ বৎসর কাল নমঃশূদ্র শ্রেণির মানুষ, যাদের সেকালের কিছু উচ্চবর্ণের মানুষরা ঘৃণা করতো চণ্ডাল, অস্পৃশ্য, অচ্ছুৎ বলতো সেই জাতির আত্মিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য প্রাণপাত প্রয়াস করেন। তবে সে প্রয়াস সেই সময় ততটা ফলবতী হয়নি, যতটা হয় মতুয়া সংগঠনের দায়ভার হরিচাঁদ ঠাকুরের (বিশ্বাস) সুযোগ্য পুত্র গুরুচাঁদ ঠাকুরের ওপর ন্যাস্ত হবার পর। মতুয়াদের ডাক দিয়ে বলেন-

"যে জাতির দল নাই, সে জাতির বল নাই।"[৩]

আবার তিনি বলেন-

"খাও বা না খাও তাতে ক্ষতি নাই, ঘরে ঘরে আমি বিদ্যালাভ চাই।
এই আমি বলে যাই সবাকার তরে, অবিদ্বান যেন পুত্র নাহি থাকে ঘরে।"[৪]

সেকালে শূদ্র পুত্রদের জন্য কোনও বিদ্যালয়ের দ্বার খোলা ছিলো না। উনি নিজের প্রচেষ্টায় অস্ট্রেলিয়ান ধর্মযাজক মিঃ মীড সাহেবের সহায়তায় ওড়াকান্দিতে হাইস্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। বাংলার সর্ববৃহৎ দলিত সম্প্রদায়ের মানুষ সেইকালে কী অবস্থায় জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়েছিল, তার একটি চিত্র পাওয়া যায়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ধর্মের অধিকার প্রবন্ধে। বাংলার দরদী কবি ১৯১১ সালে তার ক্ষোভ, দুঃখ প্রকাশ করে লিখেছেন-

> "আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম, যেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য জাতিতে চাষ করে না। তাহাদের ধান্য কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না।অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছেমানুষ যে সহযোগিতা দাবি করিতে পারে, আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহার অযোগ্য বলিয়াছে। বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জনমকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।"[৪]

জাতিকে শিক্ষিত করে না তুলতে পারলে দলন, পীড়ন থেকে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব। তাই দলিতদের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানালেন-

> "বিদ্যা ধর্ম, বিদ্যা কর্ম, বিদ্যা সর্ব সার
> বিদ্যা বিনা এই জাতির নাহিকো উদ্ধার।
> অজ্ঞান ব্যাধিতে ভরা এই দেশ
> জ্ঞানের আলোকে ব্যাধি তুমি কর শেষ
> প্রাণ যায় চলে যাক তাতে ভয় নাই
> বিদ্যা চাই, বিদ্যা চাই, বিদ্যা মাত্র চাই।"[৫]

মতুয়া আন্দোলন যদিও ধর্ম আন্দোলন, তবে এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিলো ধর্ম ও কর্মের এক মহা সম্মিলন। 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত' গ্রন্থে তৎকালীন সমাজে নিম্নবর্ণের মানুষের ওপর জমিদার মহাজনদের অত্যাচারের চিত্র বর্ণনা করেছেন-

> "যত মহাজন, জমিদারগণ
> ধনেবলে সবে রয়।
> অস্পৃশ্য যাহারা,কাঙ্গাল তাহারা
> দুঃখে দুঃখে দিন যায়।
> কর্জ করি কত অভাজন
> সুদের পাষাণতলে ছেড়েছে জীবন।"[৬]

বাংলায় বরাবরই অব্যবসায়িক, মতাদর্শ নির্ভর ক্ষুদ্র পত্র পত্রিকা প্রকাশের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরম্পরা আছে। এইসব পত্রিকা অতি দরিদ্রতার কারণে কৃশ এবং বাহ্যিক আড়ম্বর বর্জিত, যা শুধুমাত্র প্রাণের টানে এগিয়ে চলে অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে। আর্থিক সংগতিহীন স্বল্পায়ু এইসব পত্রিকার নাম লিটল ম্যাগাজিন(ক্ষুদ্র পত্রিকা)। ১৯৪৭ সাল থেকে ২০২৩ সাল পর্যন্ত বাংলা দলিত সমাজ দ্বারা এইরকম প্রায় শতাধিক সাহিত্য সংস্কৃতি এবং সংবাদ বিষয়ক ক্ষুদ্র প্রকাশন হয়েছে; সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক এসব পত্রিকার একটি তালিকা যা পাওয়া গেছে তা হল- ১৯৪৭ সালে আগরতলা থেকে প্রকাশিত হয় 'মানবতা' মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক জিতেন্দ্রলাল মজুমদার। ১৯৪৭ সালের পর বাংলার দলিত জীবনে যে চরম বিপর্যয় নেমে আসে তার ধাক্কায় সাহিত্য আন্দোলনও থমকে যায়। তবুও সেই দুর্দিনে ১৯৫২ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় অপূর্বলাল মজুমদার সম্পাদিত মাসিক পত্রিকা 'পাথেয়'। ১৯৫৫ সালে কলকাতা থেকে মনোরঞ্জন বড়ালের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'কোনও পথে' মাসিক পত্রিকা। ১৯৬২ সালে কলকাতার দমদম থেকে চিত্তরঞ্জন বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ফেডারেশন' মাসিক পত্রিকা। ১৯৬৪ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'পূর্ব ভারত' মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক শ্রী নিকুঞ্জবিহারী হালদার। ১৯৬৮ সালে নোনা চন্দনপুর থেকে প্রকাশিত হয় রাজু

দাসের সম্পাদনায় 'নবারুণ' নামে ত্রৈমাসিক পত্রিকা। পরে রাজু দাস ১৯৭৩ সালে 'নবরূপ' নামে আরেকটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। ১৯৭০ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় ধীরেন বিশ্বাস ও ড. গুণধর বর্মনের সম্পাদনায় 'সংসপ্তক' মাসিক পত্রিকা। ১৯৭১ সালে প্রকাশিত হয় 'রিপাবলিকান' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা যার সম্পাদক ছিলেন রণজিৎ কুমার সিকদার। উনি ১৯৯১ সালে বহুজন দর্পণ নামে আরেকটি ত্রৈমাসিকও চালান। ১৯৭২ সালে কলকাতা থেকে নীতিশ বিশ্বাসের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'ঐকতান গবেষণাপত্র'। মাসিক এই পত্রিকায় বিশেষত উচ্চবর্ণের অসংখ্য বুদ্ধিজীবী নিয়মিত লিখে থাকেন। 'ঐকতান গবেষণাপত্রে' উল্লেখযোগ্য সংখ্যা 'দলিত সাহিত্য' সংখ্যা। সারা ভারতবর্ষের দলিত লেখকদের রচনা মূল্যায়ন করা হয়েছে এই সংখ্যায়। 'ঐকতান গবেষণাপত্র' ত্রিপুরা সরকারের দ্বারা 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ' পুরস্কারে ভূষত হ্য। ১৯৭৪ সালে কলকাতা থেকে 'পথ সংকেত' নামের একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন শ্রী ক্ষীরোদবিহারী কবিরাজ। ১৯৭৬ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয় 'অতএব' পত্রিক, সম্পাদক ছিলেন চিন্ময় রায়। ১৯৭৬ সালে কৃষ্ণনগর থেকে নীলকমল সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় 'বাংলার নব চেতনা' নামের মাসিক পত্রিকা। ১৯৭৭ সালে নামে 'হরি সেবক' একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হয়, সম্পাদক ছিলেন দেবেন্দ্রলাল বিশ্বাস। ১৯৭৭ সালে 'অতএব' নামে একটি পত্রিকার কথা জানা যায়, যার সম্পাদক ছিলেন শ্রী ননীগোপাল সিকদার। ১৯৭৮ সালে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া' নামে আরেকটি মাসিক পত্রিকা, বড়োচাঁদঘর থেকে অক্ষয় মৌলিকের সম্পাদনায়। ১৯৭৮ সালে কাকদ্বীপ থেকে প্রকাশ হয় 'মূক নায়ক' নামে একটি ষাণ্মাসিক পত্রিকা। সম্পাদক সুনীল রতন বিশ্বাস। ১৯৭৮ সালে উত্তর ২৪ পরগণার মসলন্দপুর থেকে প্রকাশিত হয় 'গ্রাম বাংলা' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন নকুল মল্লিক। শ্রী মল্লিকের সম্পাদনায় ওই স্থান থেকে 'দলিত কণ্ঠ' নামে অন্য একটি ত্রৈমাসিকও ১৯৯৪ সাল থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে আসছে। ১৯৮০ সালে প্রকাশিত হয় 'সন্তোষ' মাসিক পত্রিকা। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মন্মথনাথ মিস্ত্রী। প্রকাশনা স্থান কলকাতা। ১৯৮৩ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়, 'নিখিল ভারত' মাসিক পত্রিকা, সম্পাদক ছিলেন বীরেন বিশ্বাস। ১৯৮৫ সাল থেকে প্রকাশিত হয়ে চলেছে সাপ্তাহিক 'বহুজন নায়ক' পত্রিকা কলকাতা থেকে। যদিও পত্রিকা সম্পাদক হিসেবে কাশীরামের নাম মুদ্রিত হয়ে থাকে, কিন্তু সম্পাদনার সব দায়িত্ব সম্পন্ন করেন শ্রী মহেন্দ্রনাথ তালুকদার। ১৯৮৫ সালে প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'লৈখী'। সম্পাদক ছিলেন ড. জ্ঞান প্রকাশ। ১৯৮৬ সালে উত্তর ২৪ পরগণার ঠাকুরনগর থেকে প্রকাশিত হয় 'হরিচাঁদ সেবা' সংঘ পত্রিকা। সম্পাদক ছিলেন নিতাই চন্দ্র মণ্ডল। ১৯৮৭ সালে ওই একই স্থান থেকে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া সেবা সংঘ' পত্রিকা। মাসিক এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন স্বপন কুমার বিশ্বাস। ১৯৯০ সালে উত্তর ২৪ পরগণার হেলেঞ্চা থেকে বাদল সরকারের সম্পাদনায় প্রকাশিত হয় মাসিক পত্রিকা 'মধুমতি'। ১৯৯৪ সালে প্রকাশিত হয় 'আজকের একলব্য' সম্পাদক ছিলেন বসন্ত কুমার মণ্ডল। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত হয় 'মতুয়া প্রতিবিম্ব' দূর্গাপুর থেকে। মাসিক এই পত্রিকার সম্পাদকের নাম সন্তোষ বারুই।

১৯৯৮ সালে প্রকাশিত হয় ষাণ্মাসিক 'এখন তখন' পত্রিকা। মঞ্জ বালা ছিলেন সম্পাদিকা। ১৯৯৪ সালে প্রকাশ হয় মনোহরমৌলি বিশ্বাসের সম্পাদনায় 'চতুর্থ দুনিয়া' ত্রৈমাসিক পত্রিকা। মনোহরমৌলি বিশ্বাস 'Dalit Mirror' নামে একটি ইংরেজি পত্রিকার সম্পাদনা করেছিলেন ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে। 'নির্ভীক সংবাদ' নামে একটি পত্রিকা ১৯৯৭ সালে নকুল মল্লিক ও রণজিৎ কুমার সিকদার উভয় মিলে প্রকাশ করেন। সাপ্তাহিক ওই পত্রিকার প্রকাশ স্থান ছিল কলকাতা। উত্তর ২৪ পরগণার হৃদয়পুর থেকে শ্রী কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের সম্পাদনায় ২০০০ সালে প্রকাশিত হয় 'নিখিল ভারত' মাসিক পত্রিকা। ২০২০ সালে প্রতিস্থিত হওয়া 'পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমি' বাংলার দলিত আন্দোলন কে সাহিত্যের মাধ্যমে অগ্রসর করেছে। তাই বলা যায় বাংলা

দলিত পত্র-পত্রিকার জগৎ বর্তমানকালে এক বৃহৎ রূপ নিয়েছে,দলিত সাহিত্যের মধ্যে কোন কোন সাহিত্য অন্তভূক্ত হবে তার একটি তালিকাও তৈরি হয়েছে। বাংলার নানা প্রান্তে এখনও অনেক পত্রিকা আছে,অনেক দলিত মানুষ পত্রিকা প্রকাশের মাধমে প্রতিদিন এগিয়ে আসছেন তাঁদের কথা জনসমক্ষে তুলে আনার উদ্দেশ্য নিয়ে।

বাংলা দলিত সাহিত্যের স্রষ্টা হবেন কারা-এ প্রশ্ন নিয়ে দলিত বুদ্ধিজীবিদের শিবির দ্বিধাবিভক্ত। এক দলের মতে ,দলিতদের প্রতি প্রকৃত সহানুভূতিসম্পন্ন যেকোনও লেখকই লিখতে পারে এমন সাহিত্য কিন্তু অন্য দল বলেন , নিগ্রোত্ব বা নারীত্ব যেমন আলাদা ভাবে লাভ করা যায় না, তেমননি অ–দলিত লেখকদেরও দলিত্ব অর্জন করা সম্ভব নয়। একজন দলিত সাহিত্যের গবেষক হিসেবে আমি মনে করি সাহিত্য বিষয়ক কোনও আলোচনায় যেমন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে এড়িয়ে যাবার উপায় থাকে না, তেমনই বাংলা দলিত সাহিত্য বিষয়ে কোনও কথা বলতে গেলে সবার আগে সম্মানের সাথে উঠে আসে একটি নাম অদ্বৈত মল্লবর্মণ। বাংলা কথা সাহিত্যে তিনি এমন একজন সাহিত্যিক, যিনি মাত্র একটি সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে সাহিত্য জগতে স্বশক্ত এক চিরস্থায়ী আসনে আসীন হয়ে গেছেন। তাঁর 'তিতাস একটি নদীর নাম', উপন্যাসটি কুমিল্লা জেলার নদীর তীরে বসবাসকারী মৎস্যজীবী মালো সম্প্রদায়ের উপাখ্যান। তাদের প্রেম,প্রীতি, স্নেহ, আশা, ভরসা, জীবন সংগ্রামের ধ্রুপদী চিত্র অঙ্কিত হয়েছে এই উপন্যাসে। লেখক নিজেও যেহেতু মালো সম্প্রদায়ের মানুষ তাই এই জীবনকে তিনি দেখেছেন একেবারে ভিতর থেকে। সেই জীবন যন্ত্রণাকে তিনি দলিতদের মুখের ভাষার কাব্যময় বর্ণনার দ্বারা জীবন্ত করে তুলেছেন। মালো মানবগোষ্ঠীর জীবনের প্রাপ্তি, হারাবার বেদনা, হারিয়ে দেবার পৌরুষ এই সব এক মসৃণ পেলবতায় উপস্থাপিত হয় এই উপাখ্যানে, যা উপাখ্যানের অবয়ব গঠনে এক যাদু বাস্তবতার স্পর্শ পেয়ে এগিয়ে চলে উপসংহারের দিকে।

আধুনিক কালে বাংলা দলিত সাহিত্য নিয়ে যিনি প্রথম চর্চা শুরু করেছিলেন তিনি হলেন মনোহরমৌলি বিশ্বাস। জন্ম খুলনা জেলার মেটের গাতি গ্রামে ৩রা অক্টোবর ১৯৪৩ সালে, মনোহর বিশ্বাস নামে সমধিক পরিচিত। দরিদ্র বাবা-মায়ের সাথে কৃষিজমিতে শিশু-শ্রমিক হিসাবে কাজ করতে করতে বিদ্যালয়ের পথে যাত্রা শুরু। পিতার নাম প্রহ্লাদ চন্দ্র বিশ্বাস ও মাতার নাম পঞ্চবালা। গাঁয়ের পাঠশালার শিক্ষকের কাছে লেখাপড়ায় হাতে খড়ি। বাড়ি থেকে অনেকটা দূরের উচ্চবিদ্যালয় থেকে পঞ্চম শ্রেণিতে বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়ে খুলনা-যশোহর জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করায় লেখাপড়ার পথ অনেকটা সুগম হয়ে ওঠে। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯৬৩ সালে বিশুদ্ধ বিজ্ঞানের স্নাতক। ১৯৬৭ সালে কলায় স্নাতক। লেখালিখির শুরু স্কুল থেকে। ইংরেজি ও বাংলায় প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা অনেক।প্রকাশিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখ্য 'দলিত সাহিত্যের দিগ্বলয়', 'দলিত সাহিত্যের রূপরেখা', 'প্রবন্ধে প্রান্তজন' অথবা 'অস্পৃশ্যের ডাইরি' 'ভিন্ন চোখে প্রবন্ধমালা' 'The Wheel will Turn', 'An Interpretation of Dalit Literature Aesthetic Theory and Movements: Through the Lens of Ambedkarism', 'Poetic Rendering As Yet Unborn', 'বিবিক্ত উঠোনে ঘর', 'বিক্ষত কালের বাঁশি', ইত্যাদি। এই লেখকের একটি ছোটগল্প 'নানচেরা বাল্মীকি', আত্মকথন 'Surviving in My world: Growing Up Dalit in Bengal' এবং 'Dalit Aesthetic' বইটি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্যসূচির অন্তর্গত হয়েছে। মনোহরমৌলি বিশ্বাসের পরে আর একজন দলিত সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা খুব দরকার তিনি হলেন কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল। তাঁর কাব্যগ্রন্থের 'নাম ধরলেই যুদ্ধ সুনিশ্চিত', 'অশ্ব সিরিজ' এবং জীবনীগ্রন্থ 'কৃষ্ণচন্দ্র ঠাকুর স্মৃতি সম্ভার'। বর্তমান সময়ে যতীন বালা বাংলা দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একজন একনিষ্ঠ কর্মী। বালা মহাশয়ের জন্ম পূর্ব বাংলার যশোর জেলার পাড়িয়ালী গ্রামে। দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে চলে এসে আশ্রয় পান অস্থায়ী উদ্বাস্তু শিবিরে। সেই অবর্ণনীয় দুরবস্থার মধ্যে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ পাশ

করেন। কিছুকাল শিক্ষকতা করার পর পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আধিকারিক হন। এই জীবনে আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলেও স্বশ্রেণীর দরিদ্র দলিত মানুষের কথা বিস্মরণ হতে পারেননি তিনি। তাই দলিত জীবনে দুর্দশা মোচনে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন সাম্য আর ন্যায়ের সংগ্রামে। রচনা করেন উপন্যাস 'অমৃতের জীবন কথা'। গল্পসংকলন'নেপো নিধন পর্ব, 'গণ্ডিভাঙ্গে বাঁধন'। কবিতা সংকলন 'মিনতি রাখেনি কেউ' এবং গবেষণা গ্রন্থ দলিত সাহিত্য আন্দোলন।যতীন বালার বিষয়ে আর একটি তথ্য হলো হায়দ্রাবাদে অনুষ্ঠিত প্রথম দলিত সাহিত্য সম্মেলনে সর্বভারতীয় প্রতিনিধির মধ্যে বাংলার যে আটজন আমন্ত্রণ পান, তার অন্যতম ছিলেন তিনি। আর একজন 'অদল বদল' পত্রিকার সম্পাদক বিমল বিশ্বাস। বর্তমানে অনেক দলিত গল্পকার তাঁদের অধিকারের লড়াইএ এগিয়ে এসেছেন তাঁদের লেখার মাধ্যমে। কুশলী গল্পকার সুশীল দাসের গল্প সংকলনের নাম 'দলিত মানুষের গল্প'। সুকুমার দাস ইনি যেমন ঔপন্যাসিক, তেমন ঐতিহাসিকও। তার দলিত চেতনায় জড়িত উপন্যাস 'কামতাপুরের পতন' এবং ঐতিহাসিক দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বস্ত পুস্তক 'উত্তরবঙ্গের ইতিহাস'

দলিত সাহিত্য নানা প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে। সবে তার কৈশোরকাল অতিক্রম করে যৌবনের সিংহ দরজায় পা রেখেছে। তাই শিল্প নৈপুণ্যে কিংবা প্রকাশ কারিগরীর আঁটোসাঁটো বাঁধনে সে পরিস্ফুট, পরিণত হতে কিছু সময় নেবে। বর্তমান সময়ে যে সব দলিত কবি নিজস্ব প্রতিভার দ্বারা কাব্য সম্পদের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছেন, তাঁদের কয়েকজন কবি অনীল সরকার, কপিলকৃষ্ণ ঠাকুর, শ্যামল প্রামাণিক, দিলীপ দাস, অমর বিশ্বাস, অচিন্ত্য বিশ্বাস, গৌতম আলি, মনোহর বিশ্বাস, শান্তি বিশ্বাস, কঙ্কর গুপ্ত, মঞ্জু বালা, নিখিলেশ রায়, মনোরঞ্জন রায়, অনিল বিশ্বাস, নিশাকান্ত মজুমদার, পশুপতি মাহাতো, ক্ষীরোদ বিশ্বাস, অনিল চন্দ্র পোদ্দার, ভুবনেশ্বর নাথ, চিরপ্রশান্ত বাগদী, সুকুমার মজুমদার, জঙ্গল রাম, হেল্লা, সুকুমার দাস, সুধাংশ শেখর মণ্ডল, রাইচরণ সিদ্ধা, মধুরিমা মণ্ডল, বিমলকান্তি বিশ্বাস, অশোক অরিদা, মনোজকুমার বাইন, চিন্ময় রায়, আশিষ বরণ সরকার, সুধমা মৈত্র, শ্যামল বিশ্বাস, হীরা সাধক, বসন্ত কুমার মণ্ডল, মহিতোষ বিশ্বাস, ঋষিকেশ হালদার, কিরণ ব্রহ্ম, চুনীরাম মাহাতো, বাদল সরকার, অনিলকৃষ্ণ মল্লিক সহ আরও অনেকে এবং কবি মনীষী অনিল রঞ্জন বিশ্বাস। অনিল রঞ্জন বিশ্বাসের দশখানি কাব্যগ্রন্থের মর্মকথাই যেন মর্মরিত হয়েছে তাঁর একটি কবিতায়

"কল্পনায় ডানায় উড়ে উড়ে যায়
কালের হাজারো সিঁড়ি বেয়ে
শোনা যায় অন্তহীন শুধু তার পাখার ঝাপট
ধ্বনি নয় প্রতিধ্বনি
ভবিষ্যৎ পানে।"[৭]

কবি অনিল রঞ্জন বিশ্বাস চর্যাপদের কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ২০০জন বাঙালি কবির, ১৮২টি কবিতা ইংরেজিতে অনুবাদ করে বিশ্বজনের দরবারে পৌঁছে দিয়েছেন। কবি অনিল সরকার কবি ত্রিপুরার মন্ত্রী। এত দায়িত্বপূর্ণ পদ সামলিয়েও তিনি কবিতা রচনায় নিমগ্ন রয়েছেন। তার কবিতা যুগ যুগ ধরে যারা ঘৃণিত অপমানিত হয়েছে, তাদের বুকের তলদেশ থেকে উঠে আসা দীর্ঘশ্বাসের মতো মনে হয়, এই পংক্তি ক'টায়। কবিতার পংক্তি ক'টি 'ব্রাত্য জনের কবিতা' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া

"মাগো তুমি শুধু বল
আমি নাকি একদিন রাজসূয় যজ্ঞের অশ্ব চড়ে
যাবো দিক দিগ্বিজয় হতে ভূমি ও বাণিজ্য দখলে
আমি বুঝি না, কেন বুঝি না মাগো

শুধু ভাবি তোর গর্ভে জন্মের যন্ত্রণা
কেন মোরে দিলি জননী।
আমৃত্যু বয়ে যাবো তাই যত অসম্মান।''[৮]

পৃথিবীর সব কবি তার সময় সমাজ, মানব, প্রকৃতির দ্বারা প্রভাবিত না হয়ে পারেন না। এবং যা অসুন্দর, অমানবিক তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না করে থাকা তার পক্ষে সম্ভব হয় না। দলিত কবিদের কবিতায় এই প্রতিবাদ একটু বেশি মাত্রায় মুখর। কবি অনিল সরকার অসংখ্য কবিতা লিখেছেন। তার কয়েকটি কাব্যগ্রন্থের নাম: 'ব্রাত্যজনের কবিতা', 'স্বজনের মুখ', 'শেষ পল্টন', 'বাতাসে পায়ের শব্দ', 'অশ্বমেধের ঘোড়া', 'হীরা সিং', 'হরিজন'। এছাড়া স্বনির্বাচিত কবিতা ও কবিতা সমগ্র। এছাড়াও রয়েছে তার পাঁচখানা ছড়ার বই– 'আয়, রঙ্গ দেখে যা', 'সার্কাস', 'টক, ভীষণ টক', 'হাওলা এক্সপ্রেস', 'কলকাতার কাল সাপ'। আছে কিছু ইংরাজি কবিতার বইও। দিল্লির দলিত সাহিত্য আকাডেমী তাঁকে দিয়েছে আম্বেদকার জাতীয় ফেলোশিপ সহ নানান পুরস্কার। অচিন্ত্য বিশ্বাস অধ্যাপক। অধ্যাপনার কাজের ফাঁকে অবসরটুকু বরাদ্দ কবিতার জন্য। তীব্র তীক্ষ্ণ ভাষায় আক্রমক মেজাজে মানবতার শত্রুদের প্রতি এইভাবে ছোঁড়েন শব্দবাণ

''মনে রাখে ভদ্দর লোকজন
আকাশের সূর্যও ভোলে না
পৃথিবীটা এখানে থেমে নাই, ঘুরছে।
ঘৃণা আর লাঞ্ছনা ছুঁড়ে আছো দিব্যি
যারা যুগিয়েছে ভাত খাদ্য
তাদের করেছ ঘৃণা তীব্র
যাদের জন্য আছে সব ঠিকঠাক
এমন কী নর্দমা
পথ ঘাট জঞ্জাল মুক্ত
তাদের হেনেছো ঘৃণা এত কাল
বদলার দিন তাই আসছে
এইসবের পাই পাই হিসাব নেবার দিন আসছে।''[৯]

কবির কাব্যগ্রন্থ 'বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ' এবং 'চারু বাউরীর গান'।

কবি শান্তি বিশ্বাস, যার কবিতা সংকলনের নাম 'শিকড়ের ডাক', 'সাক্ষী নাম্বার এক', 'মাটি মাঝি মেঘনা' 'বাউলের চিঠি', 'শতাব্দীর আলো ছাড়া'। কবির একটি কবিতায় ছিন্নমূল দলিত যন্ত্রণায় প্রকাশ হয় এই ভাষায়

''শৈশবের নদীর বুকে ভাসা
কুল পাইনি আজও
আল ছিঁড়েছে সেই অনেক বছর
হাল ধরে সেই বসে আছি।''[১০]

কবি শ্যামল প্রামাণিকের কবিতা সংকলন 'কখনও আকাশ কখনও মাটি', 'শোনো এইখানে রেখে গেলাম' এবং 'আগুনের বর্ণমালা'। এই তিনখানি কাব্য সংকলন সোচ্চার প্রতিবাদে দৃঢ় কবিতায় ভরা।

যে সব কবিদের সামান্য পরিচয় এখানে রাখা গেলো, তার বাইরে রয়ে গেছেন বহু কবি। যেমন, হরেন্দ্রনাথ ভক্ত, 'দলিতায়ন' কাব্য তার এক অনুপম কাব্য সৃষ্টি, যা বহুদিন যাবৎ 'অদল বদল' মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়ে চলেছে। প্রাচীন, আভিজাত্যময় শব্দ, অলংকার আর মননশীলতায় লেখা এই

কাব্যে পৌরাণিক বিবরণকে নতুনভাবে দেখা ও দেখানোর আন্তরিক প্রয়াস পাঠক সাধারণের প্রশংসা পাচ্ছে। আছেন কবি তেজেন্দ্র লাল মজুমদার, সুকান্ত মণ্ডল, চুনী দাস, মণীন্দ্র বিশ্বাস, অমলকান্তি নস্কর, চিন্ময় রায়, ধীরেন মজুমদার, ভবেশ রায়, তপন মণ্ডল, বিমল বিশ্বাস, সুধীর রঞ্জন হালদার, সত্যরঞ্জন হালদার, ভগবান চন্দ্র বিশ্বাস, শিবেন দাস, সুনীল ভৌমিক এবং বদরুদ্দোজা শেখ ছাড়াও বহু দলিত কবি। সামগ্রিকভাবে এই সকল কবিদের রচনা মধ্যে প্রতিবাদের রূপ বড়ো প্রখর। কখনও দারিদ্রের জন্মদাতা শাসকশ্রেণির বিরুদ্ধে, কখনও দমন পীড়ন অত্যাচারের বিরুদ্ধে। কখনও জাতপাত, বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে। কখনও অশিক্ষা কুশিক্ষা কুসংস্কার ও অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে। এইসব কবিতা তাদের কাব্যকলার মধ্য দিয়ে এক অনাগত ভবিষ্যতের ইঙ্গিত প্রকাশ করে। যেকোনও দেশের যেকোনও সংগ্রামে কবিরা পালন করে থাকেন তাঁদের মানবিক দায়িত্ব। দলিত কবিরাও তার ব্যতিক্রম নন।

উপন্যাস, গল্প, কবিতার পর বাংলা দলিত সাহিত্যের সর্বাধিক প্রকাশিত হয়েছে প্রবন্ধ। মানুষের মনন চর্চার প্রত্যক্ষ বাহন এই প্রবন্ধ সাহিত্যে যেসব প্রাবন্ধিক উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন, তার মধ্যে সর্বাগ্রে নাম করতে হয় নকুল মল্লিকের। ইনি বাংলার দলিত আন্দোলনের একজন পুরোধা পুরুষ, ইনি মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলের জীবনী লিখে বাঙালি পাঠককে পরিচিত করিয়েছেন এক পথিকৃৎ মারাঠি সাহিত্যিক, সংগ্রামীকে। অনুরূপভাবে শ্রীমতি কিরণ তালুকদার, জননায়ক মুকুন্দ বিহারি মল্লিকের জীবনী লিখে শূদ্র সমাজের একজন মানুষকে প্রকৃত মূল্যায়ন করে স্মরণীয় করে রাখবার চেষ্টা করেছেন। এই প্রকারের কাজ দলিত সাহিত্যকে তার নিজস্ব ভঙ্গিতে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য বিশেষ ভূমিকা পালন করে; যে কাজ একপ্রকার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। দলিত সমাজের শিক্ষিত সচেতন বুদ্ধিজীবীদের এ দায়িত্ব বহন করে যেতে হবে নিজের স্বার্থে।

হিন্দু ধর্মের বিষয়ে কোনও আলোচনা বাদানুবাদ তর্ক মীমাংসা যেমন বেদ বেদান্ত বাদ দিয়ে অসম্ভব, তেমন ভারতবর্ষের দলিত আন্দোলন বা সাহিত্য বিষয়ক কোনও লেখা কোনও আলোচনা সভা সেমিনার আম্বেদকারকে বাদ দিয়ে অসম্পূর্ণ, অর্থহীন, অবান্তর। বাংলার বিশিষ্ট লেখকরা আম্বেদকরের চিন্তাধারাকে বাঙালি পাঠকদের কাছে পৌঁছে দেবার অক্লান্ত প্রয়াস করেছেন। যার মধ্যে সর্বপ্রথম রঞ্জিৎ কুমার সিকদার, ননীগোপাল বিশ্বাস, ননীগোপাল দাস, শ্যামল কুমার বিশ্বাস, নরেশ চন্দ্র সরকার, স্বপন কুমার বিশ্বাস, সুকৃতি রঞ্জন বিশ্বাস, শান্তিরঞ্জন বিশ্বাস, মনোহর বিশ্বাস, যতীন বালা, ননীগোপাল সিকদার, প্রমুখ। রঞ্জিৎ কুমার সিকদারের বঞ্চিত জনতার মুক্তিযোদ্ধা ডাঃ আম্বেদকার, আম্বেদকারের সংক্ষিপ্ত জীবনী, সমাজ সম্পর্কে আম্বেদকারের চিন্তাধারা, জাত ব্যবস্থার বিলুপ্তি, প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। কপিলকৃষ্ণ ঠাকুরের মতুয়া আন্দোলন ও বাংলার অনুমত সমাজ এবং তাঁরই সম্পাদিত গ্রন্থ গুরুচাঁদ ঠাকুর ও অন্তাজ বাংলার নবজাগরণ। বাংলার ইতিহাসের এক বিস্মৃত অধ্যায়কে এইসব পুস্তকে গভীর সংবেদনশীলতায় তুলে ধরা হয়েছে।

দলিত প্রাবন্ধিক জীবনের অমোঘ তাড়নায় দলিত মুক্তির তীব্র তৃষ্ণায় দলিত সাহিত্য আন্দোলনকে বেগবান করার উদ্দেশ্যে প্রবন্ধ নিবন্ধকে হাতিয়ার করে লক্ষ্যের দিকে যাত্রা করেছেন। প্রখর যুক্তিবোধ, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন মতাদর্শগত সিদ্ধান্ত।দলিত প্রবন্ধকার একদিকে যেমন ইতিহাসের সত্যাসত্য পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ অনুসন্ধানের ওপর বর্তমান সময়ে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দলিত অবস্থানকে প্রতিফলিত করে আগামীর সম্ভাবনা এবং বিজয়ের চূড়ান্ত পরিণতি প্রমাণিত করতে চেয়েছেন; অন্যদিকে বিশ্লেষণ করেছেন দলিত আন্দোলনের ক্রমপর্যায়ের অভ্যন্তরীণ সমস্যা, মন্থর গতির কারণ ও ব্যর্থতার সূত্রগুলো। এক একজন প্রাবন্ধিক এক এক দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়গুলো দেখলেও সামগ্রিকভাবে সবার উদ্দেশ্যে একটাই তা চির অবনত মানবগোষ্ঠীর মুক্তির পথনির্দেশ। যে কারণে প্রবন্ধগুলো নিছক নিরস প্রবন্ধ না হয়ে, হয়ে উঠেছে সংগ্রামী মানুষের এগিয়ে চলার পাথেয়। দলিত সাহিত্য আন্দোলনের একজন তাত্ত্বিক নেতা মনোহর

বিশ্বাস একখানি অনন্যসাধারণ প্রবন্ধগ্রন্থ রচনা করেছেন 'দলিত সাহিত্যের দিগ্বলয়'। এই গ্রন্থের এক অভিনব সংযোজন ভারতীয় সাহিত্য ধারায় স্থান করে নেওয়া দলিত মারাঠি, কানাড়ি সাহিত্যসহ অন্যান্য ভাষায় লিখিত দলিত সাহিত্যের বিষয় উপস্থাপন। বিভিন্ন ভাষায় প্রকাশিত ১৩টি প্রবন্ধের আলোচনা দ্বারা বাঙালি পাঠকদের কাছে মোটামুটিভাবে দলিত সাহিত্যের গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটি ধারণা গড়ে দিতে চেষ্টা করেছেন। ১৯৯২ সালে পুস্তকটি প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বই দলিত ১৯৯৭ সালে সম্পাদনা করেছেন দেবেশ রায়, যিনি নিজে দলের নন। সাহিত্য একাডেমী থেকে এই প্রবন্ধ পুস্তকটি আসলে মারাঠি দলিত লেখক অর্জুন ডাঙলে সম্পাদিত পয়জন ব্রেড এর বাংলা অনুবাদ।

দলিত মুক্তি আন্দোলন ও দলিত সাহিত্য সম্পর্কে কিছু ভিন্ন ধরণের আলোচনা করেছেন হরেন্দ্রনাথ ভক্ত তার 'দলিতবাদের রূপ ও স্বরূপ' (প্রথম খণ্ড, ১৯৮৭) পুস্তকে ও নকুল মল্লিক তার 'ভাবনা চিন্তা' (১৯৯৩) গ্রন্থে।

বাংলা দলিত সাহিত্য আলোচনায় মনোরঞ্জন ব্যাপারীর নাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গ দলিত সাহিত্য আকাদেমির সভাপতি। অধুনা বিলুপ্ত পূর্ব পাকিস্তানে বরিশাল জেলার এক দরিদ্র দলিত পরিবারের জন্ম। জন্মের প্রায় সাথে সাথে দেশভাগজনিত কারণে পরিবারের সবাই এপার বাংলায় চলে আসেন এবং এক রিফিউজি ক্যাম্পে স্থান পান। প্রায় ছয় বৎসর ক্যাম্প বাসের পর মনোরঞ্জনের বাবার দণ্ডকারণ্য না যেতে চাওয়ার অপরাধে সব রকম সরকারি সাহায্য বন্ধ হয়ে যায়। সংসারে নেমে আসে চরম অভাব অনটন অরন্ধন। ফলে মনোরঞ্জনের কোনও স্কুলে যাবার সুযোগ ঘটে না। বাল্যকাল কাটে ছাগল, গরু চরিয়ে। একটু বড়ো হলে চায়ের দোকান, হোটেলের টেবিলবয়, তারপর মুটে মজুর, রিকশা চালক, রান্নার লোক। জীবনে প্রায় এক দেড়শো রকম কাজ করতে হয় তাঁকে দু'বেলা দুমুঠো অন্ন সংস্থানের জন্য। জুতো সারাই, ডোম, সুইপার, নাইট গার্ড, এমনকি এক অনাথ আশ্রমের হয়ে কিছুকাল কমিশনে ভিক্ষা করে বেড়াতে হয় ক্ষিদের তাড়নায়। জীবনের এক পর্বে জড়িয়ে যান উগ্র বাম রাজনীতির সঙ্গে। ফলে জেলযাত্রা ঘটে জীবনে। জেলে বসে নিতান্ত সময় কাটাবার বাসনায় লেখাপড়া শুরু করেন। দীর্ঘদিন পরে যখন জেল থেকে ছাড়া পান, তখন মন মস্তিষ্কে এক অদৃশ্য ভাইরাসের মতো চাড়িয়ে গেছে বই পড়ার ভয়াবহ নেশা। শুরু হয় তার বইয়ের সাথে সহবাস। ফুটপাতে, গাছতলায়, রেলস্টেশনে যেখানে যে অবস্থায় থাকেন দু'চোখ থাকে কোনও বইয়ের পাতায়। তখন মনোরঞ্জন রিকশা চালাতেন। সেই দিনে এক সময় ওঁর রিকশায় সওয়ার হন স্বনামধন্য সাহিত্যিক মহাশ্বেতা দেবী। মনোরঞ্জন শিক্ষিকা জ্ঞানে ওঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলো "জিজীবিষা" শব্দের অর্থ। জীবন বদলে যায়, মনোরঞ্জনের। মহাশ্বেতা, তাঁর পত্রিকা বর্তিকা র জন্য মনোরঞ্জনকে লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। মনোরঞ্জনের সেই প্রথম লেখা; যা 'মদন দত্ত' ছদ্মনামে 'রিকশা চালায়' শিরোনামে ১৯৮১ সালের জানুয়ারি সংখ্যা 'বর্তিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তারপর এই পর্যন্ত শতাধিক পত্র পত্রিকায় গল্প, উপন্যাস, কবিতা, প্রবন্ধ লিখেছেন। তার প্রথম প্রকাশিত গল্প সংকলনের নাম 'বৃত্তের শেষ পর্ব'। ২০০০ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত ২২টি বাছাই গল্প আছে এই সংকলনে। তাঁর লেখা 'খাঁচার পাখিরাও গান গায়' এই গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রে রয়েছে একজন নিম্নবর্গের অপরাধ প্রবৃত্তির মানুষ। যার ধারণায় নির্ধন, নিরন্ন মানুষের বেঁচেবর্তে থাকার প্রকৃষ্ট স্থান হচ্ছে জেলখানা, যেখানে খাবার, শোবার, অসুখে চিকিৎসা পাবার সামান্য হলেও কিছু ব্যবস্থা আছে, যা তথাকথিত মুক্ত জগতে নেই। তাই তার সগর্বে ঘোষণা জেল ছাড়া আমাদের আর হারাবার কিছু নাই। 'নেশা' নামক গল্পের প্রধান চরিত্রে আছে একজন অন্নদাতা রিকশা চালক, যে পেট বোঝাই ক্ষিদে নিয়ে সওয়ারী তুলছে নিজের রিকশায়। ইচ্ছা, সওয়ারী নামিয়ে পয়সা নিয়ে চাল কিনে বাসায় যাবে। ভাত খাবে। মোটা চালের ধোঁয়া ওঠা গরম ভাত। কিন্তু ক্ষিদে চালিত অশক্ত শরীর তাকে শেষ পর্যন্ত পৌঁছতে দেয় না। মাঝপথেই অজ্ঞান করে পথের ধুলোয় ফেলে দেয়। গরম

ভাতের স্বপ্ন দেখতে দেখতে মরে যায় রিকশাওয়ালা। 'স্বাধীনতা' গল্পের নায়ক একজন বুভুক্ষ মানুষ, যে রেশন দোকানে মোট বয়। যেদিন সারা দেশ স্বাধীনতার উৎসবে মাতোয়ারা, সেদিন তার ঘরে চাল নাই। মোট বইবে বলে রেশন শপে গিয়ে দেখে তালা বন্ধ। কেননা আজ সরকারি ছুটি যে! সামনে হাজার বস্তা চাল, পিছনে উৎসব মুখর মানুষ, দুইয়ের মাঝে একজন মানুষ যে আশি কোটি জনতার প্রতিনিধি। বন্ধ তালার সামনে তার বিক্ষুব্ধ আবিষ্কার এই স্বাধীনতা অর্থহীন, মানার কোনও মানে নেই। 'কঠিন গদ্য' একটি চোরের গল্প, যে খিদের তাড়নায় চুরি করে বসে তারই মতো আরেক ক্ষুধার্তের মুখের অন্নগ্রাস। ধরা পড়ে বেদম মার খায় আর একজন অন্নহীন আবাসহীন স্টেশন বাসিন্দার হাতে। 'ভাতের রাজা', এটিও না খাওয়া মানুষের গল্প। গল্পের নায়ক তার শিশুপুত্রদের খেতে দিতে না পেরে গলা টিপে মেরে ফেলে এবং সেই কেসে যাবোজ্জীবন সাজা পেয়ে জেলে এসে ভাতঘরের 'মেট' হয়ে যায়। দশ বারো হাজার কয়েদির জন্য রান্না করা ভাতের গাদার সামনে দাঁড়িয়ে সে ফেটে পড়ে তীব্র চিৎকারে "বাপরে একমুঠো ভাতের জন্য তোরা মরে গেলি, চেয়ে দেখ আজ কত ভাত আমার। আমি ভাতের রাজা।" বৃত্তের শেষ পর্বের সংকলিত সবকটা গল্পই নিরন্ন নির্ধন মানুষের হলেও শুধুমাত্র 'নারায়ণ সেবা' ছাড়া অন্য গল্পকে সেই অর্থের দলিত সাহিত্য বলা চলে না। 'নারায়ণ সেবা' গল্পে নায়ক এক উচ্চবর্ণীয় সামন্ত প্রভু। যার ইচ্ছা পৈত্রিক শ্রাদ্ধে এমন অতুল কীর্তি করা যা বহু বছর মানুষের স্মৃতিতে অমলিন হয়ে গেঁথে যায়। সেই উদ্দেশ্যে সে পিতৃ শ্রাদ্ধের ভোজে যত কাওড়া বাগদী উপোসী সম্প্রদায়ের মানুষকে নিমন্ত্রণ করে আনে। নানা প্রলোভন দিয়ে তাদের উস্কাতে চায় অতিমাত্রায় ভোজন করার জন্য। কিন্তু পূর্বে গুরুভোজন করে এক সামন্তগৃহে কয়েকজন মারা যাওয়ায় উপোসী মানুষেরা সতর্ক ছিলো। তারা ফাঁদে পা দেয় না। উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায় দেখে অবশেষে খাদ্যে বিষ প্রয়োগ করা হয়, সামন্ত প্রভুর নির্দেশে। বহু লোক মারা যায়। স্থাপিত হয় অতুল অতুল কীর্তি! এই গল্পটিতে নিরন্ন দলিত মানুষকে কীভাবে উচ্চবর্ণের মানুষরা গিনিপিগ তুল্য মনে করে নিজস্ব পরীক্ষানিরীক্ষা চালানো হয় যার সূচনা হয়েছিলো সেই মহাভারতের কালের জতুগৃহে পাঁচ নিষাদ পুত্রকে সমাতৃক পুড়িয়ে মারার মধ্য দিয়ে তা দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে।

মনোরঞ্জনের দ্বিতীয় গল্প সংকলনের নাম 'জিজীবিষার গল্প'। ১৭টি গল্প নিয়ে ২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত পত্র পত্রিকায় বাছাই গল্পের সংকলন এটি। রবিশস্য, অদল বদল, হাটে বাজারে, আটুল বাটুল, জলাভূমি, প্রতিদিন, পদক্ষেপ, সবুজ, আলিঙ্গন, কথা, সাময়িক, প্রভৃতি পত্রিকায় পূর্বে প্রকাশিত হয় এই গল্পগুলো।

স্বাধীনতার-পরবর্তী দলিত সাহিত্যের উপস্থিতি দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে স্পষ্টভাবে লক্ষ করা যাচ্ছে। তবে বাংলায় সেই উপস্থিতি তুলনামূলকভাবে দেরিতে দৃশ্যমান হয়েছে। কিন্তু এখানে 'উপস্থিতি' বলতে বোঝানো হচ্ছে-পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ, সংকলন, অনুবাদ এবং ধীরে ধীরে একটি স্বতন্ত্র সাহিত্যধারায় পরিণত হওয়া। বলা যায়, বাংলা সাহিত্যের মূল ধারার ভেতরেও এই প্রবাহ ক্রমশ জায়গা করে নিচ্ছে আজকাল। পশ্চিম ভারতে বেশ কয়েক দশক ধরে দলিত সাহিত্য একটি সচেতন আন্দোলন হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু বাংলায় দীর্ঘদিন তা তেমন গুরুত্ব পায়নি। আজও স্কুল-কলেজের পাঠ্যক্রমে দলিত সাহিত্যের উপস্থিতি সীমিত। এর একটি বড় কারণ, সাহিত্য নির্ধারণের ক্ষেত্রেও দীর্ঘদিন ধরে জাতি ও বর্ণের আধিপত্য কাজ করেছে। পরিস্থিতি এখনও সম্পূর্ণ বদলায়নি কিন্তু পরিবর্তনের ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাই বলা দরকার দলিত সাহিত্য শুধুমাত্র আন্দোলনের মুখপাত্র নয়, কেবল একটি বিশেষ বাস্তবের উপস্থাপনাও নয়।তার চেয়ে বেশি কিছু।

তথ্যসূত্র:

১. মহুয়া, অনিন্দিতা ও রমন, শুভা। হিন্দি দলিত সাহিত্য। প্যাপিরাস, ১৯২১, কলকাতা, পৃ. ৭।

২. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন।জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২২।

৩. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৪।

৪. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৫।

৫. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৫।

৬. ব্যাপারী, মনোরঞ্জন। জীবনের ডানদিক বামদিক। ঋতবাক, কলকাতা, ১৪২৭, পৃ. ৩২৭।

৭. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৫।

৮. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব। তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩২।

৯. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৮।

১০. প্রামাণিক, মৃণ্ময়। অনুবাদ শরণকুমার লিম্বালে (মূল গ্রন্থ)। দলিত নন্দনতত্ত্ব, তৃতীয় পরিসর, কলকাতা, ২০১৭, পৃ. ৩৯।

Primary Sources:

1. Ambedkar, B. R. Annihilation of Caste. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 1, edited by Vasant Moon. Dr. Ambedkar Foundation, 1979. Reprint 2014, pp. 23–96.
2. Ambedkar, B. R. Buddha or Karl Marx. In Dr. Babasaheb Ambedkar: Writings and Speeches, Vol. 3, edited by Vasant Moon. Dr. Ambedkar Foundation, 1987. Reprint 2014, pp. 441–462.
3. Bagul, Baburao. “Dalit Literature is but Human Literature.” In Poisoned Bread, edited by Arjun Dangle. Bombay: Orient Blackswan, 2009, pp. 274–294.
4. Byapari, Manoranjan. “Is There a Dalit Writing in Bangla?” Translated and introduced by Meenakshi Mukherjee. Economic and Political Weekly, Vol. 42, No. 41, 2007, pp. 4116–4120.
5. Dangle, Arjun, ed. Poisoned Bread: Translations from Modern Marathi Dalit Literature. Bombay: Orient Blackswan, 2009.
6. Das, Sisirkumar. “The Narratives of Suffering: Caste and the Underprivileged.” In A History of Indian Literature: 1911–56. New Delhi: Sahitya Akademi, 1995.
7. Dasan, M., et al., eds. Malayalam Dalit Writing. New Delhi: Oxford University Press, 2012.
8. Dhasal, Namdeo. Namdeo Dhasal: Poet of the Underworld: Poems 1972–2006. Edited by Dilip Chitre. New Delhi: Navayana, 2007.
9. Kothari, Rita. “Short Story in Gujarati Dalit Literature.” Economic and Political Weekly,vol36 no45,2001,pp 4308-4311
10. Limbale, Sharankumar. Towards an Aesthetic of Dalit Literature. Translated by Alok Mukherjee. New Delhi: Orient Longman, 2010.

Online Sources:

Dalit Panthers Manifesto

https://raiot.in/dalit-panthers-manifesto/
Dr Ambedkar's Journalism: From "Mooknayak" to "Prabuddha Bharat"
https://www.forwardpress.in/2020/01/dr-ambedkars-journalism-from-mooknayak-to-prabuddha-bharat/
Ganesh, Deepa. "From the Fringes."
https://www.thehindu.com/features/friday-review/theatre/From-the-fringes/article16215491.ece